অ্যা লেটার টু অ্যাথিইস্ট

মুগনিউর রহমান তাবরীজ

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

কারা বেশি সুখী, বিশ্বাসীরা নাকি অবিশ্বাসীরা ২১
যা দেখি না, তা বিশ্বাস করি না ২৭
আমার কী দোষ ৩৭
স্রষ্টাকে সৃষ্টি করেছে কে ৪৮
মুসলিম মানেই জঙ্গি ৫৩
স্রষ্টায় বিশ্বাসীরা সত্যিই মানসিক রোগী ৬২
স্রষ্টার শক্তি কি সীমাবদ্ধ ৭১
ফলসিফিকেশন টেস্ট ৭৮
জিন কথন ১১২
কুরআন কি বাইবেল থেকে কপি করা ১২৪
কুরআনে গাণিতিক ভুল; নাকি আজ্ঞেয়বাদীর অজ্ঞতা ১৩৯
কেন শুধু কুরআন মানবো ১৪৭
বিবর্তনবাদের ব্যবচ্ছেদ ১৫৭
তেতো কথা ২০৪
স্রষ্টা ছাড়াই মহাবিশ্ব ২১৮
দ্বীন ধর্ম রিলিজিয়ন ২২৭

লাশটা কার? কী করেই-বা খুনটা হলো? সবার মুখে একটাই প্রশ্ন। প্রশ্নাতুর চোখে তাকাচ্ছে একজন অন্যজনের দিকে। রাজধানীর এমন অভিজাত এলাকায় কড়া নিরাপত্তার মধ্যেও কীভাবে একটা জলজ্যান্ত মানুষ খুন হতে পারে? আর বাহির থেকেও তো এই লাশ এলাকায় প্রবেশ করানোর কোনো সুযোগ নেই। তাহলে এখানে কীভাবে এলো? কোনোভাবেই কারও মাথায় ঢুকছে না। এমন গভীর রহস্যে ভরা চিন্তার মধ্যে আচমকা একটা উঁচু আওয়াজ শোনা গেল, 'আহারে বদনসিব, এমন যুবক বয়সেই রাস্তায় পড়ে মরতে হলো! এমন একটা তাজা মানুষকে খুন করতে একটাবারের জন্যও বুক কাঁপল না? আরে বাবা কেউ না দেখুক, আল্লাহ তো দেখছে যে, তুই খুন করছিস। কাল কিয়ামতে কী জবাব দিবি? আহ! সবই তাকদিরের লিখন!'

গলার আওয়াজ শুনে ধ্যান ভাঙল অ্যান্টনির। এমন একটা ক্রিটিক্যাল মুহূর্তেও ভাগ্যের ওপর এরূপ অদ্ভুত বিশ্বাস দেখে মেজাজটা আর ঠিক রাখতে পারল না সে।

একটা খুনের যথাযথ কারণ অনুসন্ধান না করে, তার বিচারের দায়ভার চাপাচ্ছে আল্লার ওপর! যাকে দেখা যায় না, যার কোনো প্রমাণ নেই, যার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করা যায় না, সেই আবার করবে বিচার! আরে ভাই, আল্লা যদি দেখেই থাকে কে খুনটা করেছে, তাহলে তাকে থামাল না কেন? তাকে থামালেই তো টগবগে একটা জীবন বেঁচে যেত। আর খুনিকেও মানব হত্যার মতো অপরাধ করতে হতো না, বিশৃঙ্খলাও সৃষ্টি হতো না। আচ্ছা, না হয় বুঝলাম তাকে থামাল না। কিন্তু এখন তো বলে দিতে পারে কে খুনটা করেছে? সৃষ্টিকর্তা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাবেন, আবার সেটা করার জন্য ব্যক্তিকে শাস্তিও দেবেন, এটা কোনো লজিক হতে পারে না। আচ্ছা, এই যে লোকটা খুন হলো, তিনি যদি স্রষ্টায় অবিশ্বাসী মুক্তমনা হয়ে

থাকে সে তাহলে এতক্ষণে কি তার শাস্তি শুরু হয়ে গেছে? আবার যে খুনটা করল, তাকেও জাহান্নামে পুড়তে হবে। এ কেমন কথা?

বুঝলাম, এই লোকটি স্রষ্টায় বিশ্বাস করত না, তাই জাহান্নামে যাবে। কিন্তু খুনি লোকটার কী হবে? তার ভাগ্যে তো স্রষ্টাই লিখে রেখেছেন, সে খুনটা করবে। তাই এখন সে খুন করল, ব্যস। দোষ তো তার না। অথচ সেও নাকি জাহান্নামে পুড়বে! এমন বেমানান নিয়ম কি কখনো ন্যায়বিচার হতে পারে? একজন সৃষ্টিকর্তাই যদি থাকবেন, তাহলে তাঁর সবকিছুতেই কেন ভুল থাকবে? বিচারিক কাঠামোয় ভুল, মানুষের শরীরে ডিজাইনগত ভুল, তাঁর পাঠানো দাবিকৃত কিতাব কুরআনের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ভুল! স্রষ্টা কেন ভুল করবে? আসলে সৃষ্টিকর্তার ধারণাটাই ভুল। পুরোটাই মানুষের কাল্পনিক বিলাস মাত্র; যা বিজ্ঞান ও যুক্তি কখনোই সমর্থন করে না। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, সবকিছুর স্রষ্টা আল্লা হলে আল্লার সৃষ্টিকর্তা কে?’

এতক্ষণে এক নিশ্বাসে মনের সমস্ত চাপা ক্ষোভ ঝেড়ে নিল অ্যান্টনি। কিন্তু তা উচ্চারণ না করে মনের ভেতরেই সীমাবদ্ধ রাখায় কেউ আওয়াজ শুনতে পেল না। নিজের আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা কোনো মানুষকেই মুক্তমনা বলে মনে হলো না। সব মানুষই গোঁয়াড়, ধর্মে বিশ্বাসী। এই গোঁয়াড়গুলোকে যতই দেখছে, ততই মেজাজ খারাপ হচ্ছে তার। উৎসুক মানুষের চিল্লাচিল্লি, পুলিশের গাড়ির সাইরেন, বাঁশির বিরক্তিকর শব্দ, মিডিয়া কর্মীদের ভিড়, সবমিলিয়েই একটা বিরক্তিকর পরিবেশ। ভিড় ঠেলে বের হয়ে একটা রিকশায় চেপে বসল। সোজা বাসায় এসে ধপাস করে শুয়ে পড়ল অ্যান্টনি।

শরীরে জ্বর জ্বর ভাবটা এখনও কাটেনি। তাই গত তিন দিন ধরে অফিসেও যাওয়া হচ্ছে না তার। মাথাটা খুব ঝিম ধরে আছে, শুয়ে চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর চেষ্টা করছে। মাথা ঝিম ধরে থাকা যতটা না কষ্টকর, তার চেয়ে বেশি কষ্টকর ঘুমের জন্য অপেক্ষা করা। এই জগতে অপেক্ষার সময়গুলো যেন কাটতেই চায় না।

‘আচ্ছা, অপেক্ষার সঙ্গে কি আপেক্ষিকতার কোনো সম্পর্ক আছে?’ নিজেকে প্রশ্ন করে অ্যান্টনি।

মুক্তমনা হওয়ার পর থেকে একটা দারুণ সুবিধা হয়েছে। সবকিছুতেই বিজ্ঞান ও যুক্তি অনায়াসে চলে আসে। আচ্ছা, জগতের কোনো কিছুই তো ধ্রুবক নয়, সব আপেক্ষিক। সময়ও আপেক্ষিক, অপেক্ষার ঘড়ি আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটি অর্থাৎ আপেক্ষিকতার সূত্র মেনে ধীরে চলবে, খুব ধীরে।

কিন্তু নাহ! কথাটা ঠিক নয়। সময়, ঘড়ি বা অন্য কোনো কিছুই আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটি মেনে চলে না। সবকিছুই আগে থেকেই তার নিজের মতো করে চলে। আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটি থেকে আপেক্ষিকতা, ধ্রুবক ইত্যাদি বিষয়ে জানা যায় মাত্র। অন্যদিকে আলোর গতি আপেক্ষিক নয়, ধ্রুবক। বিজ্ঞান যেকোনো সময় যেকোনো চমক দিতে পারে। হয়তো কয়দিন পর জানা যাবে আলোর গতি ও ধ্রুবক নয়, আপেক্ষিক।

যেমন, ৩০০ বছর ধরে রাজত্ব করেছিল নিউটনের তত্ত্বগুলো। অথচ মাত্র কিছুদিন আগে প্রমাণ হলো, নিউটনের সব তত্ত্ব সব ক্ষেত্রে চলে না। বেচারার মহাকর্ষীয় বলের ক্ষেত্রেও ঘোরতর আপত্তি জানালেন মহামতি আইনস্টাইন।

আবার ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে রাজত্ব করেছে আইনস্টাইনের তত্ত্ব। এখন দেখা গেল ব্ল্যাকহোল এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের সূত্র অচল। এভাবেই কিছুদিন পরপর বিজ্ঞান নতুন নতুন চমক দেখাচ্ছে।

প্রফেসর সামির ওকাশার একটা কথা মনে পড়ল। তিনি বলেছিলেন, ‘বিজ্ঞান এত দ্রুত বদলায় যে, আপনার পছন্দমতো বিজ্ঞানের যেকোনো শাখাই বিবেচনা করুন না কেন, আপনি নিশ্চিত হবেন, ওই শাখার প্রভাবশালী থিওরি ৫০ বছর আগের

থিওরির চেয়ে অনেক ভিন্ন। আর ১০০ বছর আগের চেয়ে ব্যাপক ভিন্ন হবে।'[১]

ব্রিটিশ গণিতবিদ, পদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিদ স্যার জেমস জিনস (Sir James Jeans) তাঁর *The New Background of Science* নামক গ্রন্থে বলেছেন,

> We can never say that any theory is final or corresponds to absolute truth, because at any moment new facts may be discovered and compel us to abandon it.
>
> 'আমরা কখনোই কোনো তত্ত্বকে চূড়ান্ত কিংবা নিরঙ্কুশ সত্য বলে ঘোষণা করতে পারি না। কারণ, যেকোনো সময়ে ওই তত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নতুন তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে।'[২]

---

১. Philosophy of science, A very Short Introduction- Samir Okasha; p.77 (Oxford University Press, 2002)

২. সেমিনার স্মারক-গ্রন্থ (২০০৩-২০০৫), বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, পৃষ্ঠা : ৪৭-৪৮

জার্মান পদার্থবিদ ম্যাক্স প্লাঙ্ক (Max Plank) বলেছেন–

> We have no right to assume that any physical laws exist or if they have existed upto now, that they will continue to exist in a similar manner in the future.
>
> ‘জগতে কোনো প্রাকৃতিক নিয়ম বা সূত্রের অস্তিত্ব আছে বলে ধরে নেওয়ার কোনো অধিকার আমাদের নেই। বর্তমানে যদি তেমন কোনো সূত্র থেকেও থাকে, তা ভবিষ্যতেও একই রকম থাকবে- এমনটি বলা যায় না।’[৩]

আসলে বিজ্ঞানীরাই বলেন, ‘বৈজ্ঞানিক সত্য কখনোই চূড়ান্ত সত্য নয়; বরং যা আজ সত্য হিসেবে বিবেচিত, হয়তো কাল তা পরিবর্তিত, এমনকি বাতিলও ঘোষিত হতে পারে।’[৪]

---

৩. সেমিনার স্মারক-গ্রন্থ (২০০৩-২০০৫), বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, পৃষ্ঠা : ৪৭-৪৮

৪. National Center for Science Education, https://ncsc.com/node/16774 (বিশ্বাসের যৌক্তিকতা, রাফান আহমেদ, পৃ : ৬৩)

এসব ভাবতে ভাবতে চোখ লেগে এলো অ্যান্টনির। কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। মাইকের আল্লাহু আকবার... আল্লাহু আকবার... শব্দে চোখ খুলে গেল। ঘুমাতে না ঘুমাতেই ঘুম ভেঙে গেলে মেজাজ এমনিতেই খিটখিটে হয়ে যায়। আর আজানের শব্দে ঘুম ভেঙে যাওয়াতে মেজাজটা আজ একটু বেশিই খারাপ হয়ে গেল। চোখে-মুখে মহা বিরক্তির ছাপ।

'হাতে ক্ষমতা থাকলে আজকেই শব্দদূষণ প্রতিরোধ আইন তৈরি করতাম। যত্তসব! এই মুসলমান চরমপন্থি, জঙ্গি, মোল্লাগুলোর যন্ত্রণায় আর শান্তিতে থাকা যায় না।' অ্যান্টনি বিড়বিড় করে নিজে নিজে কথাগুলো বলে চলছে।

অবশ্য এই বুদ্ধিহীন ক্যাটাগরির মোল্লা টাইপের লোকগুলোর কাছ থেকে মাঝে মাঝে কমেডির চাহিদা পূরণ হয়ে যায়। এটা খারাপ না। এমন চিন্তা করেই ফিক করে হেসে দিলো সে। আল্লাহকে কি কখনোও দেখেছেন? না দেখলে বিশ্বাস করেন কেন? সবকিছু যদি আল্লাহ ভাগ্যেই লিখে রাখেন,

তাহলে পাপ করলে আমাদের দোষ কী? এমন কিছু মৌলিক প্রশ্ন করলেই মোল্লাদের দফারফা। তাদের একটাই উত্তর, 'মরলে বুঝবা বাজান, মরলে বুঝবা' এই বলে পালাবে। হা হা হা...

কয়েকদিন আগের কথা–

অফিস থেকে আসার সময় অ্যান্টনি টি-স্টলে দাঁড়িয়ে চায়ে চুমুক দিচ্ছিল। ঠিক তার পাশেই দুজন লোকের কথোপকথন তার কানে ভেসে এলো। একজন মোল্লা এক রিকশাওয়ালাকে বোঝাচ্ছে,

'বুঝলা, খালি খাইয়া-দাইয়া আনন্দ-ফূর্তি করার লাইগা আল্লাহ আমগোরে এই দুনিয়ায় পাঠায় নাই। আল্লাহর ইবাদত করতে হইব, সিজদা দিয়ে তাঁর কাছে মাথা নত করতে হইব।'

'তাতে কী লাভ? ইবলিস শয়তান কি ইবাদত কম করছে? তারপরেও সে নাকি দোজখে যাইব। আল্লায় তারে দোজখে দিলে তার এত ইবাদতের কী দাম রইল?'

‘অহংকার, দ্যামাগ-গরিমা কইরা ইবলিস তার নিজের জায়গা জাহান্নাম কইরা লইছে। আল্লাহ আদম নবিরে বানাইবার পর, তারে কইছে সিজদা দিতে। কিন্তু ইবলিস নিজেরে সেরা দাবি কইরা আল্লাহর কথা শুনল না। হের লাইগা কাফির হইয়া গেছে। আইচ্ছা, একটা কথা ভাবো তো, এই যে আমি এই মসজিদের মুয়াজ্জিন, এখন মসজিদ কমিটি একজন ইমাম বানাইয়া সবাইরে কইল তারে ইমাম মানতে। সবাই মাইন্যা লইল। কিন্তু আমি যদি কই, এই লোকেরে আমি ইমাম মানি না। কারণ, আমি এই মসজিদে গত দুই বছর ধইরা আছি। এখন আমিই ইমাম হইবার যোগ্য, এই লোক না। তাইলে কি কমিটি আমারে ইমাম বানাইব, নাকি চাকরি নট কইরা দিবো?’

‘খুব সোজা। পগাড়পার, মানে চাকরি খাইয়া আপনারে ক্ষ্যাদাই দিবো।’

‘হ সহজ কথা, ইবলিস শয়তান নিজেরে বড়ো মনে কইরা গরিমা দেখাইছে, আল্লাহর আদেশ অমান্য করছে, আবার আল্লাহর লগে জেরা করছে।

তারপরও সে যদি আল্লাহর কাছে মাফ চাইত, আল্লাহ তারে মাফ কইরা দিত। কিন্তু শয়তান তা করে নাই। আমরাও এই শয়তানের পাল্লায় পইড়া আল্লাহর অনেক অবাধ্য হই। বাজান, আল্লাহর কাছে মাফ চাও, নামাজ-রোজা ধরো। আল্লাহ মাফ কইরা দিবো। আল্লাহ বড়ো দয়ালু।'

'হ, আল্লাহ বড়ো দয়ালু। আল্লাহ দয়ালু হইলে আমরা না খাইয়া থাকি ক্যান? কেউ ট্যাকার বিছানায় ঘুমায় আর কেউ ট্যাকার অভাবে খাইবার পায় না। কন তো হুজুর, এইডা আল্লার কেমন বিচার?'

'আল্লাহর দিকে অভিযোগ দিলা? আহা! আমরা তো আল্লাহর কোনো হক আদায় করবার পারি না। আল্লাহ আমাগোরে হাত দিছে, পাও দিছে, আলো-বাতাস-রিজিক সব দিছে। এইডা মনে পড়ে না? একটু কষ্ট সহ্য করবার পারো না? আল্লাহর দিকে অভিযোগ? এইডা পরীক্ষা, আল্লাহ কুরআনে কইছে, "ধন-সম্পদ, ফসল-ফলাদি, পোলা-মাইয়া, অসুখ-

বিসুখ দিয়া তাঁর বান্দাগো নানান রকমের পরীক্ষা নিব। যে টিকব, হেই পাইব বেহেশত।”[৫] আর হাদিসে আছে– আল্লাহর রসূল কইছে, “গরিব লোক ধনী লোকের ৫০০ বছর আগে বেহেশতে যাইব।”[৬] এই কারণে আল্লাহ কুরআনে কয়, “ওয়া কানাল ইনসানু কাফুরা- মানুষ বড়োই অকৃতজ্ঞ।”[৭] “কুল্লু নাফসিন যা-ইকাতুল মাউত-বেবাক প্রাণী একদিন মরণের স্বাদ গ্রহণ করব।”[৮] মরণ একদিন আইব বাজান, মরলে বুজবা। আল্লাহ তোমারে বুঝ দান করুক। আমিন।’

বলেই মোল্লা সাহেব বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল। মোল্লা সাহেবের চলে যাওয়া দেখে, অ্যান্টনির খুব হাসি পেল। রিক্সাওয়ালার প্রশ্নটা খুব সহজ ছিল। একটু মাথা খাটালেই লজিক্যালি উত্তর দিতে পারত। যেমন : আল্লাহ যদি সবাইরে ধনী বানাত, তাহলে পৃথিবীর ভারসাম্য ঠিক থাকত না। সবাই

---

[৫]. সূরা বাকারা-০২ : ১৫৫

[৬]. জামে আত-তিরমিজি, হাদিস নং-২৩৫৩ (হাসান সহিহ)

[৭]. সূরা বনি ইসরাইল-১৭ : ৬৭

[৮]. সূরা আলে ইমরান-০৩ : ১৮৫

ধনী হলে ঘরে বসেই সব পেতে চাইত। কাজ কে করত? চাষ কে করত? ফসল আসত কোথা থেকে? খেতো কী? অবশ্য বর্তমানের অর্থনৈতিক মন্দার জন্য মুসলমানদের আল্লাহকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সারা বিশ্বে চলছে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা। এই অর্থব্যবস্থায় সামনে পিঁপড়া দেখিয়ে পেছনে হাতি পার করা হয়। বড়োলোক আরও বড়োলোক হবে, ছোটোলোক আরও ছেটো। যতদিন সমাজতন্ত্র সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিষ্ঠা করা না যাবে, ততদিন সমস্যা থেকেই যাবে। পুঁজিবাদ হচ্ছে মানুষকে অর্থ দিয়ে বিবেচনা করা, যেখানে মানুষের কোনো মূল্যায়ন হয় না। কেবল সমাজতন্ত্রই পারে সব সমস্যার সমাধান করে মানুষের সব অধিকার নিশ্চিত করে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে।[৯] মনে মনে এভাবেই স্বগতোক্তি করছিল অ্যান্টনি।

অ্যান্টনি স্রষ্টা, ধর্ম এবং স্রষ্টার পাঠানো কোনো ধর্মগ্রন্থকে বিশ্বাস না করলেও মানুষ হিসেবে যথেষ্ট

---

৯. একজন মার্কস্বাদীর চিন্তা

যুক্তিবাদী। যুক্তি সঠিক হলে সে মেনে নেবে। কিন্তু মোল্লাগোষ্ঠীরা যুক্তির আশপাশ দিয়ে না হেঁটে খালি কাল্পনিক জান্নাত-জাহান্নামের ভয় দেখায়। এটাই তার বিরক্তির কারণ। আবারও সেই ডায়লগ মনে পড়ে গেল, 'মরলে বুঝবা...' হেসে উঠল সে।

হঠাৎ করেই জানালার ওপর চোখ পড়াতে হতচকিত হয়ে উঠল অ্যান্টনি। জানালার ওপাশ থেকে এক জোড়া চোখ তাঁর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সন্ধ্যার আলো আঁধারির মধ্যে এমন অদ্ভুত অবয়ব দেখে কিছুটা জমে গেল এবং ভয়ও পেল। ভূত-প্রেতের প্রতি বিশ্বাস তার একেবারেই নেই। তারপরেও কেন জানি মনে হচ্ছে, বুকের বামপাশটা স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশিই কাঁপছে।

'কে?' শব্দটি পুরোপুরি বের না হয়ে গলায় আটকে থাকল। অ্যান্টনি বুঝতে পারল আতঙ্কে তার গলা এমন অদ্ভুত আচরণ করছে। তাই গলাটাকে ভালো করে ঝেড়ে আবার ডাকল, 'কে? কে ওখানে?'

'হে... হে... স্যার আমি। স্যার কি ভয় পাইছেন?'

হাসির সঙ্গে দুপাটি দাঁত দেখে লোকটাকে চিনতে দেরি হলো না অ্যান্টনির। সে অফিসের পিয়ন হারু মিয়া। ওর প্রশ্ন করার ধরন দেখে ঠাশ করে থাপ্পর দিয়ে দুইটা আক্কেল দাঁত ফেলে দিতে ইচ্ছা হলো। কিন্তু মেজাজটাকে নিয়ন্ত্রণে নিল। এই লোকটা প্রচণ্ড টাকালোভী। এটা তার স্বভাব নাকি অভাবের কারণে হয়েছে, কে জানে। জ্বর থাকার কারণে গত তিন দিন অফিসে যাওয়া হয়নি। দুদিনের বেশি অফিসে না গেলে আর্জেন্ট জমা পড়া ফাইলগুলো নিয়ে সোজা বাসায় চলে আসে লোকটি। খুবই চিকন বুদ্ধির মানুষ। ফাইলটাকে ভাঁজ করে বড়ো একটা চিঠির খামে ঢোকাবে। এরপর প্রেরকের জায়গায় নিজেই কোনো একটা নাম লিখে দেবে। তারপর খামগুলো সেই পুরোনো আমলের সাইডব্যাগে ভরে সোজা বাসায় দিয়ে যাবে। বিনিময় মাত্র দুইশত টাকা। দুইশত টাকার জন্য লোকটা কেন যে এত রিস্ক নেয়? ধরা খেলে চাকরি টেকানো মুশকিল। কে

জানে, এই দুইশত টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব হয়তো তার কাছে অনেক বেশি।

দরজার দিকে যেতে যেতে কথাগুলো চিন্তা করছিল অ্যান্টনি। লোকটা তাকে একা একা হাসতে দেখেছে। মনে মনে যে কী ভাবছে? যাই ভাবে ভাবুক। তবে ভাবনা পালটে দিতে বেশি কিছু করতে হলো না। দরজা খোলার আগেই বাম কানে একটা ব্লুটুথ ইয়ারফোন লাগিয়ে নিল। আর তাতেই যে কাজ হলো, সেটা দরজা খোলার পর বুঝতে পারল।

'হে হে হে। ও, আপনি ফোনে কথা কইতেছিলেন। কী অবাক কাণ্ড বলেন তো! আমি মনে করেছিলাম, আপনি একা একাই হাসতেছেন।'

'কয়টা ফাইল নিয়ে এসেছ?'

'স্যার, ফাইল তো একটা। কিন্তু এইটা নিয়া আসতেই কাঁধে ব্যাথা ধইরা গেছে। আচ্ছা স্যার,

একটা কথা জিগাই?’ ফাইলটি অ্যান্টনিকে দিতে দিতে বলল হারু মিয়া।

‘হুম বলো। তবে সংক্ষেপে বলো। তুমি তো আবার শুরু করলে কথার শেষ খুঁজে পাও না।’

‘সবই আপনাদের দুআ স্যার। এখন বেশি কথা কইতে পারি না, বয়স হইছে। আপনার ভাবি গালি দেয়, সেও আপনার মতো একই কথা কয়। বুঝেন না স্যার, মহিলা মানুষ তো, একটু বেশি কথা কয়। তয় আমি গুরুত্ব দিই না। এইটা তাগো স্বভাব। গুণী লোকে কয়, মরলেও নাকি স্বভাব যায় না। আচ্ছা আপনি কন তো, আমি কি বেশি কথা কই? এই তো সেদিন ডাক্তার কইল...’

‘আহা, এই তো তুমি আবার শুরু করে দিলে। কী বলতে চাচ্ছ তাড়াতাড়ি বলো।’

‘এই দেখছেন ভুলেই গেছিলাম। আচ্ছা স্যার, এই যে আপনার কানে ইয়ারফোন দিছেন। এল্লাইগা আমি বুঝলাম, আপনি কারও লগে কথা

কইতাছেন। তয় বিজ্ঞানীরা যদি এমন কিছু বানায়া ফালায় যে, মোবাইল, ইয়ারফোন ছাড়াই কথা কওন যাইব, তাইলে কি আপনারে পাগল মনে করতাম না?’

‘চুপ করো তো! বেশি কথা বলে। তোমার দেখি রোগটা আরও বেড়ে গেছে।’ বলেই দুম করে দরজা বন্ধ করে দিলো অ্যান্টনি।

খামটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে। আজকের খামটা অনেক মোটা। এক মগ কফি হাতে না নিলে ফাইলে হাত দেওয়া যাবে না। ফাইলের আকার বড়ো হলে কফির পর সিগারেট ধরানোর অভ্যাস আছে। স্ত্রী জেনেফা গির্জায় গেছে। নিজে ধর্মে বিশ্বাস না থাকলেও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী স্ত্রীকে নিয়ে সংসারে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। জেনেফার আসতে প্রায় রাত হবে। কী আর করা! এক মগ কফি বানানো আহামরি কোনো কাজ না। বক্সখাটের সঙ্গে হেলান দিয়ে আরাম করে বসে

কফিতে চুমুক দিয়েই খামটার ওপর মনোযোগ দিলো অ্যান্টনি।

হারু মিয়ার বহন করা খামের একটা মজার ব্যাপার আছে। তা হলো-প্রাপকের নাম ঠিক থাকবে, কিন্তু প্রেরকের জায়গায় এমন একটি নাম দেবে, যার নাম অফিসের লোকজন তো দূরের কথা, কেউ কখনও শুনেছে কি না সন্দেহ। কৌতূহলবশত আজকেও প্রেরকের নামে চোখ বোলালো। কী আশ্চর্য! অতীব আশ্চর্য! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না অ্যান্টনি। তার চোখ কি ভুল দেখছে? মাথাটা ঝাঁকিয়ে দুহাত দিয়ে চোখ দুটো ভালোভাবে কচলিয়ে নিল। কিন্তু নাহ, আগে যা দেখেছিল এখনও ঠিক তাই দেখছে।

'বাট হাউ ইট'স পসিবল?' নিজেকে প্রশ্ন করল অ্যান্টনি।

সদা হাস্যোজ্জ্বল আর উচ্ছ্বাসে ভরা একটি মুখ। দেখলেই মায়া লাগে। যেখানেই যায় সবাইকে

মাতিয়ে রাখে। ভদ্র ও মেধাবী হওয়ার কারণে সবাই আদর করে। ছোটোকাল থেকে নামাজ-রোজার প্রতি বেশ ঝোঁক, কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট-এ উঠার পর থেকেই ক্রমান্বয়ে মৌলবাদী ধারার দিকে ঝুঁকতে থাকে। একটা পর্যায়ে বিজ্ঞানবিরুদ্ধ আজগুবি সব কথাবার্তা বলা শুরু করে। অ্যান্টনি বুঝতে পারল। তার আদরের ছোটো ভাই মুক্তমনা হওয়ার বিপরীতে বদ্ধমনা হয়ে গেছে। বিপদসীমার বাহিরে চলে যাওয়ার আগেই বাবার কাছে নালিশ করে। কিন্তু ফলাফল যা হওয়ার তাই হলো। অ্যান্টনি আগে থেকেই জানত, বাবা ছোটো ভাইয়ের পক্ষ নেবে। তারপরেও বলেছিল, যেন ভবিষ্যতে সে গোঁড়া না হয়ে যায়। মিরাজ অ্যান্টনির ছোটো ভাই। চার বছর আগে ধর্ম, স্রষ্টা নিয়ে কথা বলার এক পর্যায়ে আব্বা-আম্মার সঙ্গে প্রচণ্ড রাগারাগি করে বাড়ি ছাড়ে অ্যান্টনি। তারপর থেকে আর বাড়ি যায়নি।

আজ বহুদিন পর প্রেরকের ঠিকানায় মিরাজের নাম দেখে খানিকটা স্তব্ধ হয়ে গেল অ্যান্টনি। একবার

ভাবল, হারু মিয়া তাকে চমকানোর জন্য এমন কাণ্ড করেনি তো? কিন্তু এই নাম তো হারু মিয়ার জানার কথা না! নাকি তাকে চমকে দেওয়ার জন্য কারও থেকে নাম জেনে নিয়েছে। সাতপাঁচ ভাবা বাদ দিয়ে তড়িঘড়ি করে খাম থেকে ফাইল বের করতেই কপালে ভাঁজ পড়ে গেল। আরে! এটা তো একটা চিঠি। কিন্তু সাইজ দেখে মনে হচ্ছে আস্ত একটা পাণ্ডুলিপি।

চিঠিটা যে মিরাজের হাতে লেখা, তা চিনতে ভুল হলো না। বহুদিন পর হৃদয়পটে মিরাজের সরল মুখখানা ভেসে উঠল। অনেক দিন হয়ে গেছে খোঁজখবর নেয়নি। মিরাজ এমন একটা কাজ করে চমকে দেবে, সে কল্পনাও করেনি। অবশ্য মিরাজ ছোটো থেকেই এমন। মাঝেমধ্যেই অদ্ভুত কিছু একটা করে সবাইকে চমকে দিত। কী লিখেছে জানার কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে চিঠি পড়ায় মন দিলো অ্যান্টনি। পাশে রাখা গরম কফির মগটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল কিছুক্ষণের জন্য।